স্বামীজীর অন্যান্য গ্রন্থাবলী

- উপাসনা পদ্ধতি।
- পার্থিব শিবলিঙ্গ রহস্য বা প্রতীকি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহজ উপায়।
- শ্রী শ্রী দশমহাবিদ্যা।
- গীতায় গুরুশিষ্য (প্রথম খণ্ড)
- গীতায় গুরুশিষ্য (দ্বিতীয় খণ্ড)
- ধর্ম প্রবেশিকা।
- গীতা মাধুরিকা

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

ঋষিধাম

জঙ্গল কোকদণ্ডী, ডাকঘর-গুণাগরি

বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

শালগ্রাম তত্ত্ব

শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ পুরী

শালগ্রাম তত্ত্ব

বা

শিলা পূজার তাৎপর্য্য

মৃদ্ঘন জগতের চিদ্ঘন ব্রহ্ম-বিজ্ঞান

লাভের সহজ উপায়।

ওঁ

শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ পুরী

সঙ্কলয়িতা ঃ

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ

প্রকাশক ঃ

শ্রীমৎ স্বামী সুদর্শনানন্দ পুরী মহারাজ
মোহন্ত মহারাজ, ঋষিধাম, বাঁশখালী ও
তুলসীধাম, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

মোহন্ত মহারাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ

শ্রী গোপালকৃষ্ণ কানুনগোয়
চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল ঃ
সপ্তদশ ঋষিকুম্ভ, ১৪১৭ বাংলা

মুদ্রণেঃ
চকরিয়া প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
০১৮১৯-৮৯৪৮৩০

মূল্যঃ ১৫ টাকা মাত্র।

ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমর্ত্ততাগ্রে
ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীংদ্যামুতেমাং
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

ঋগ্‌বেদ-৮।৭।৩।১

অনন্ত জ্যোতির আধার অমৃতরূপী পরমেশ্বরই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। সূর্য্য হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে যিনি রচনা পূর্ব্বক স্বমহিমায় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই সুখস্বরূপ পরম দেবতারই আমরা উপাসনা করি, অন্যের নহে।

উৎসর্গ

আধ্যাত্ম বিদ্যায় অনুরাগী ধর্ম্মপিপাসু
নিখিল
নর-নারীর উদ্দেশ্যে সাগ্রহে—

ॐ

নমোহস্তু গুরবে যস্মিন্ পদ্মপলাশ-লোচনে।
জগদানন্দ রূপায় সচ্চিদানন্দ দায়িনে।

* * * *

প্রেমময়, প্রেমময় সবার জীবন।
রুদ্ধদ্বার খোল মোর, দাও দরশন।।
তোমার আলোকে হোক সবার প্রকাশ।
ওগো কর্ত্তা অবিনাশী ওগো শ্রীনিবাস।।
স্বপ্রকাশ চিদানন্দ অমৃতের খনি।
"শ্রীগুরুজগদানন্দ" জাগাও অবনী।।

সর্ব্বাধ্বনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে।

যো দদাতি নিগৃহ্ণাতি ধিয়ঃ প্রচোদয়া স ন।।

শালগ্রাম শিলাত্মং বদত্র ঋষি-ভাষিতং।

পুরো ভবতু তৎ তত্ত্বং সচ্চিদানন্দ সংজ্ঞিতম্।।

* * * *

তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিগণ সুধাসার বিনিন্দন,

কর্ম্ম জ্ঞান-যোগ-কথা বিতরণ ছলে।

বিষ্ণু-চক্র শালগ্রাম সচ্চিদানন্দ ধাম,

ধ্যানের সুগম পথ রেখে কৌশলে।

সর্ব্বব্যাপী পরমেশ রসের স্বরূপ।

ভাবতীত ভাব যাঁর শিলা ব্রহ্মরূপ।।

এই পথে অনুগত, সাধু মহাত্মারা যত,

লভিয়াছে দিব্যজ্ঞান যাঁর প্রেরণায়।

ভক্তজনে অনুরক্ত, নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত,

প্রতিভাত হোন তিনি আমার হিয়ায়।।

নিখিল আত্মার আত্মা হৃদয়ের স্বামী।

নতশিরে যুক্তকরে নমি তাঁরে নমি।।

ভূমিকা

একদা প্রাচীন ভারতে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আপ্তকাম হইয়াছিলেন; ইহা সর্ব্বজন বিদিত। ঐ ঋষি সন্ততি পৌত্তলিক ছিলেন, এইরূপ ধারণা করা অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। আমরা পৌত্তলিক নহি। সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যগণ আমাদের জন্য পুতুল পূজার বিধান প্রণয়ন করিয়া যান নাই, ইহা সর্ব্বথা অসম্ভব ও অবাস্তব। বস্তুতঃ প্রতিমায় ভগবদ্ আরাধনা চিত্তসংযমনের উন্নততর আবিষ্কৃত সহজ ও সদ প্রণালী বিশেষ। শুধু অন্তরের অন্তঃস্থলের দিব্যানুভূতির অবিকল ও অকৃত্রিম সংবেদন-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তাহারই অনুবেদন বাহী প্রতীক গ্রহণ

করিয়াছেন, এই জ্ঞান রত্নাকর ঋষিগণ। তাঁহারা এইভাবে প্রতীকতত্ত্ব আবিষ্কার পূর্ব্বক আত্ম-বিদ্যা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ঋষি শিল্প। ঋষি শিল্পে অর্চ্চনার বস্তু হিসাবে বহু প্রতীক রহিয়াছে, তন্মধ্যে শালগ্রাম শিলা অন্যতম।

শালগ্রাম শিলাচক্রের অবলম্বনে যেভাবে নারায়ণের অর্চ্চনা আবিষ্কৃত ও বিহিত হইয়াছে, তাহার তথ্য উদঘাটন করিতে আমরা এস্থলে যথাসম্ভব প্রয়াস পাইয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবিশেষের যৎকিঞ্চিৎ উপকার ও সংসাধিত হয়, তথা ঋষি পথের অনুসরণ দ্বারা ঐশ্বরিকতায় অবগাহণ করিবার সুযোগ ঘটে এবং পরমানন্দ লাভের উপায় হয়, তবে আমাদের শ্রম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে মনে করিব।

সঙ্কলয়িতা -

শালগ্রাম তত্ত্ব

—উপক্রমণিকা—

শিলাপূজার তাৎপর্য্য

"লিঙ্গ স্থণ্ডিল বহ্ন্যম্বু যন্ত্র কুড্য পটে সু চ।
মণ্ডলে বিশিখে মূর্দ্ধনি হৃদিবা দশকীর্ত্তিতঃ"।।

লিঙ্গ (প্রতিমা), স্থণ্ডিল (যজ্ঞের বেদী), বহ্নী, জল, যন্ত্র, কুড্য (মন্দির), পট, মণ্ডল, বিশিখ (প্রতিবিম্বপাতযোগ্য) অস্ত্রাদি (চিহ্ন), মূর্দ্ধা (শিরোদেশ) এবং হৃদয় এই দশটি পূজার আধার।

কিন্তু দুগ্ধ গাভীর সর্ব্বাঙ্গজ হইলেও যেমন একমাত্র স্তনমুখে ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ ভগবান সর্ব্বব্যাপী হইলেও মন্দিরাদি বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশিষ্টরূপে একমাত্র সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। কাজেই প্রমাণিত হয়, মুখ্য পূজাভূমি হইতেছে, আমাদের হৃদয়। মন্দিরাদি অপর নয়টি বস্তু স্মরণ ও মনন করিবার উপায়রূপে গৃহীত। ইহারা মনের বহির্মুখীগতিকে অন্তর্মুখী করিবার কৌশল হিসাবে পরিকল্পিত ও নির্দ্ধারিত হওয়ায় ভগবদ্ বিষয়ক রতির অবলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবরূপে স্থিত। বস্তুতঃ সর্ব্বভাব প্রকাশক হৃদয়ের সন্ধান না পাইলে পূজা নামক ঋষিশিল্পে বিন্দুবিসর্গ জ্ঞান হয় না বা হইতেই পারে না। তাই আমাদের হৃদয় কি, - ইহাই হইতেছে এক্ষণে আলোচনার প্রধান ও প্রথম বিষয়।

জ্ঞানীগুরু বশিষ্ঠদেব বলেন, - জীবের জ্ঞানচৈতন্যই তাহার হৃদয়। আমরা যে পৃষ্ঠ ও বক্ষোদেশের মধ্যভাগকে হৃদয় বলি, ইহা তাহা নহে, ইহা স্থূল। আমরা বলিতেছি এস্থলে **সূক্ষ্ম অনুভব পদের কথা, যাহা সাধনার একমাত্র গম্যস্থল, যাহা চিদ্ উপলব্ধির কেন্দ্র**। কাজেই ঋষিগণ অস্থিমাংসময় শরীরের মধ্যভাগকে হৃদয়রূপে গ্রহণ না করিয়া আমাদের জ্ঞানচৈতন্যকেই হৃদয় বলিয়া গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

"হৃদি অয়ম্ ইতি হৃদয়ম্"

যেখানে অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মস্বরূপ "ইনি এইরূপ" এইভাবে নির্দ্দেশিত হয়, তাহাই হৃদয়। পরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) জীব-চৈতন্যের সহিত অপরিচ্ছিন্ন (অসীম) ব্রহ্ম-চৈতন্যের যোগাযোগ রাখার নিমিত্ত এই হৃদয় হইতেছে একমাত্র স্বভাবসিদ্ধ মুক্ত পথ। এই মুক্ত পথে চলিতে থাকিলে ক্রমে জ্ঞান হয়। প্রতিমারহস্য মিথ্যা বা রূপক নহে, উহা সত্য। ঋষি যাহা স্থূলে-ভৌতিক রাজ্যে বাহ্য পূজার আকারে অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই সূক্ষ্মে চৈতন্যরাজ্যে আমাদের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক সাধক, - সমুদ্রে উদ্বেলিত তরঙ্গমালার ন্যায় অনন্ত-দেবরূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব তাহারই হৃদয়তটে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তরঙ্গকে উপেক্ষা বা স্পর্শ না করিয়া যেমন সমুদ্রে অবগাহন করা যায় না, ঠিক তেমনি ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন করিতে হইলে, জীবকে একটি না একটি দেব-প্রকাশ অবলম্বন করিতে হয় অন্যথা গত্যন্তর নাই। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কোন কোন ভাগ্যবান সাধক, যাঁহারা জীব-কোটি,-ভূমা ব্রহ্মসত্ত্বার অবধারণে অসমর্থ, তাঁহারা সহসা ব্রহ্ম সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন, অন্তর্লীন হইয়া আত্মহারা হন, তাহাতেই তাঁহাদের মানবজীবনের চরিতার্থতা লাভ হয়।

শ্রুতি বলেন, -

তাহার পুনরায় আবর্তন হয় না।

আর যাঁহারা বিচারবান্ সহসা ব্রহ্ম সমুদ্রে ঝাঁপ দেন না, বরং তাঁহাদের হৃদয়তটে আসিয়া উহারই হিল্লোল কল্লোল-অনন্তদেব-রূপের আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং উহাদের বিশিষ্ট রূপ-মাধুরীর বিচিত্রতা অধ্যয়ন করেন। তাঁহারা বলেন,.. ব্রহ্মবিদ্যা বোধোদয় রূপ অপ্রাকৃত জ্ঞানগ্রন্থের এই দেবদেবী সকল অপ্রাকৃত বর্ণমালা। অ, আ, ই, উ প্রভৃতি বর্ণমালা যেইরূপ লৌকিক বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ঠিক তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যও অলৌকিক অক্ষর এই সকল দেবদেবী সুপরিকল্পিত। লৌকিক বিদ্যা সান্ত, পরন্তু ব্রহ্মবিদ্যা অনন্ত। কাজেই লৌকিক বিদ্যার ন্যায় ইহাতে বর্ণমালার কোন সুনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। তাই বলা হয় দেবতা তেত্রিশ কোটি অর্থাৎ অনন্ত।

চিন্তাশীল মানব এই দিব্য প্রকাশ নিচয় অধ্যয়ন করিয়াই জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ে পরিতৃপ্ত হন। এবং উহারই নিরন্তর অনুমননে ব্যাপৃত থাকিয়া ঋষিপদে উন্নীত হইতে পারেন। ফল কথা, ঋষিই দিব্যপ্রকাশের যথার্থ অধ্যেতা। ঋষি এক একটি দেব প্রকাশ-এক একটি অক্ষর অধ্যয়ন করিয়াছেন; আর আমাদের মতো স্থুলবুদ্ধি মানবে সূক্ষ্ম দর্শনের দ্বার উদঘাটন করিবার মানসে, এক একটি প্রতিমা এক একটি

অরূপের রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। দিব্য স্ফুরণের অনুকরণ ব্যতীত মানবের সাধ্য কোথায় যে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের সৃষ্টি করে। আমরা সিংহবাহিনী দুর্গার, মূষিক বাহন গণেশের, অথবা শবাসনা কালীমায়ের অলৌকিক ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হই; "মূর্খস্য প্রতিমা দেবা:" বলিয়া উহাদের যথার্থ্য নির্ণয়ে ইতি দিয়া থাকি, ইহা বড় অন্যায়। বস্তুতঃ উহারা ঋষিকৃত নূতন কিছুই নহে; তৎসমস্ত ব্রহ্ম সত্ত্বায় স্ফুরিত কেবল ঐ ঘন চৈতন্যের অবিকল অধ্যয়নের নিমিত্ত আহৃত উপকরণ মাত্র। ইহা ঋষিদের, "অনুভূত সত্য সম্বেদন। ইহা সত্য হইতে মহান সত্যে উপনীত হইবার মত তাহাদের সহজ সুন্দর পরিকল্পনা"। ইহা তথাদৃষ্ট ঋষি-শিল্প।

এই ঋষি-শিল্পে অর্চ্চয়িতব্য বস্তু হিসাবে আদি প্রতীক গ্রহণ করা হইয়াছে, শালগ্রাম-"শিলাচক্র"। যিনি অনাদি, যাঁহার আদিতে কোন বস্তুর প্রকাশ নাই, যাঁহার প্রকাশে যত ইতি চরাচর প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত যাঁহাতে স্থিত ও প্রলয়ে পুনরায় যাঁহাতে উপসংহৃত হইয়া যাইবে, সেই অনন্ত জগতের সমাশ্রয় শ্রী শ্রী ভগবানের অর্চ্চনার প্রতীক হিসাবে একখানি শিলাচক্র ঋষিদের সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহার আদ্যোপান্ত আলোচনার একান্ত প্রয়োজন। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই শিলাচক্র দর্শনে কৌতুহল উদ্দীপিত না হইয়া পারে না যে, ইহা কি! আশ্চর্য্যের বিষয়, ধ্যান-বর্ণিত রূপের সহিত এই শিলারূপের কুত্রাপি সাদৃশ্য

নাই। তথাপি আমরা অন্ধের ন্যায় ঋষিবাহিত পথে চলিয়া আসিতেছি। আমাদের চির আচরিত গতি পথে কোনরূপ সন্দেহ, কোন প্রকার সঙ্কোচ বা কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিবার মত সংকল্প আমাদের এখনও হয় নাই। যদিও বর্ত্তমান কালে আমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই, এই বিষয়ের তত্ত্ব উদঘাটনে উদাসীন থাকিয়া গতানুগতিক ধারায় চলিয়া আসিতেছেন, সুখের বিষয় আজকাল আবার অনেকেই এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন এবং তদনুরূপ জিজ্ঞাসাও চতুর্দ্দিকে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা, কালের গতি ঘুরিয়া আসিয়াছে। আমরা এইক্ষণে আর্যবেদনে অনুবেদিত হইতে চাই। ঋষির জ্ঞান, ধ্যান ও তত্ত্ব বিচার বিষয়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভেই আজ আমাদের তৃপ্তি।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"।।

-গীতা ১৮/৬৯

মানবজন্মের পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করিতে হইলে, মানবকে তাহার হৃদয়নিহিত চিৎতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন করিতে হয়। নচেৎ দুর্নিবার মায়ার আবর্ত্তনে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাকে অনন্ত-ভুবন ভ্রান্তির গহন গহ্বরে পড়িয়া শত শত মরণ-মূর্চ্ছার অনুভব করিতে হয়, শত সহস্র উচ্চাবচ গতি সঙ্কুল বিবিধ কর্ম্ম ভূমিকায় অবতরণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই গুণময়ী দুরতিক্রমনীয়া মায়া উত্তরণের একমাত্র উপায় হইতেছে আমাদের হৃদয়-বিহারী মায়াপতির সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি লাভ করা। কেবল তাঁহারই কৃপায় জীবের শাশ্বত শান্তি, - ব্রহ্মধাম লাভ হয়। ইহা বিচার করিয়া জীবের পরম মঙ্গল অপেক্ষায় ঋষিগণ মায়াতরণের সুগম উপায় নির্দ্দেশ করিতে গিয়াছেন। ঐ চিৎতত্ত্ব অধিগত হওয়াই আমাদের মায়াতরণের একমাত্র পন্থা এবং তাহার সম্যক অধ্যয়ন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তাহারই অনুরূপ প্রতীক তদীয় শিষ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, - একটি শিলাচক্র যাহার নাম "শালগ্রাম"।

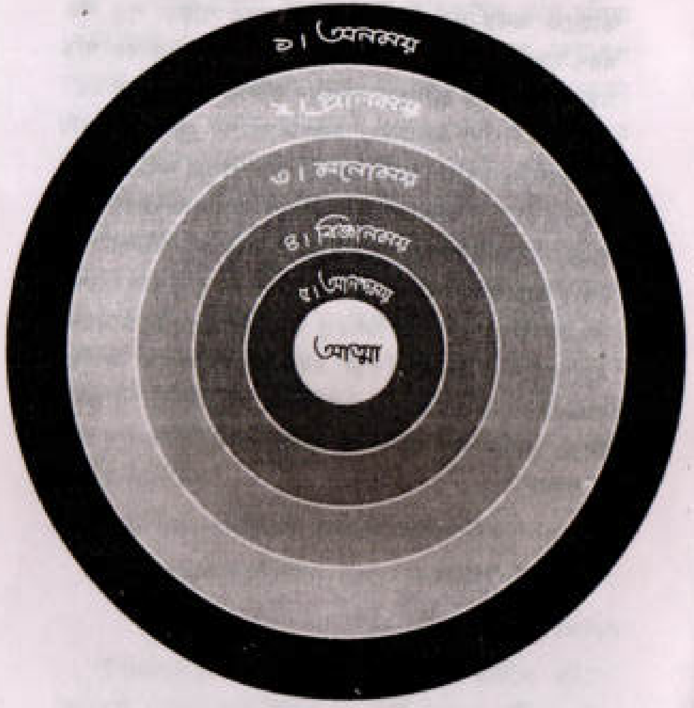

শালগ্রাম

'শাল' অর্থে আবরণ এবং 'গ্রাম' অর্থে অনেক। অনেকটি আবরণে অর্থাৎ ঐ পঞ্চকোষে উপহিত আত্মারই নাম শালগ্রাম। স্থুল শরীর অন্নময় কোষ, সূক্ষ্ম শরীর, মন, প্রাণ ও বিজ্ঞানময় কোষের সংযোগ, সর্ব্বশেষ আবরণ আনন্দময় কোষকে কারণশরীর বলা হয়। জাগ্রত দশায় স্থুল শরীর, স্বপ্নদশায় সূক্ষ্ম শরীর ও স্বপ্নবিহীন নিদ্রায় কারণ শরীর প্রকাশিত থাকে।

অন্নময় কোষঃ

অন্নময় কোষ মাতা ও পিতার ভুক্ত অন্ন রসে উৎপন্ন, শুক্র ও শোণিতের মিলনে সঞ্জাত; কেবল আহার্য্যরসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাজেই আমাদের স্থুল দেহ অন্ন রসময়, অন্নের বিকার, অন্ন না পাইলে বিকৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

প্রাণময় কোষঃ

অন্ন গ্রহণ করে প্রাণে। দেহ সঞ্জীবিত থাকে প্রাণের দ্বারা। প্রাণ কিন্তু প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান নামে পঞ্চধা বিভক্ত। ধারণ, লঙ্ঘন, চালন, ক্ষেপণ ও প্রসারণ গুণভেদে পুনরায় প্রাণক্রিয়াও পঞ্চপ্রকার। প্রাণন শক্তির উক্ত পঞ্চভাবে বিভক্ত হইয়া পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সহযোগে এই স্থুলদেহকে যথাযথভাবে কার্য্যকরী অবস্থায় রক্ষা করিতেছে। প্রাণক্রিয়া একান্ততঃ রুদ্ধ হইয়া গেলে দেহের অস্তিত্ব থাকে না।

পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চভূতে লয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ বলেন, প্রাণন ক্রিয়ার দ্বারা যে অবস্থায় দেহ প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রাণময় থাকে তাহারই নাম প্রাণময় কোষ। ইহা আত্মার দ্বিতীয় আবরণ।

মনোময় কোষঃ

প্রাণ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে একমাত্র মনের মনন শক্তি প্রভাবে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া মননশক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব পঞ্চমনের সংযোগজ অবস্থাই আত্মার তৃতীয় আবরণ নামে কথিত হয়। ইহাই মনোময় কোষ।

বিজ্ঞানময় কোষঃ

বর্ণিত অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ আমাদের নিশ্চলা বুদ্ধিবৃত্তিতে সংস্থিত। সর্ব্ববিধ জ্ঞান-জননের ভূমি হইতেছে আমাদের বুদ্ধিসত্তা। বুদ্ধির সুনিশ্চিত পরিকল্পনা অনুসারে বিশেষ বিশেষ অনুভবের ক্ষেত্র আমাদের এই অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ রচিত হইয়াছে। কাজে কাজেই আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সংকৃত বুদ্ধিসত্তাই আত্মার চতুর্থ আবরণ বিজ্ঞানময় কোষ নামে সুধীজনে পরিচিত।

আনন্দময় কোষঃ

"একোহং বহুস্যাম্" সঙ্কল্পে আনন্দময় কোষ উৎসৃজিত হইয়াছে। আমি একা, আমি বহু হইব, বহুভাবে ক্রীড়া করিব এই প্রকার সঙ্কল্পই আত্মার আনন্দময়তা। স্বকীয় সিদ্ধ সঙ্কল্পে আত্মা তাই নিত্য আনন্দময়। কেননা আত্মা স্বয়ংশক্তি ও স্বরাট্। উর্ণনাভ যেরূপ নাভি নিঃসৃত তন্তুদ্বারা জাল রচনা করিয়া তন্মধ্যে নিজেই অবস্থান করে তদ্রূপ আত্মাও আত্মমায়া বিস্তার পূর্ব্বক নিজের মধ্যে নিজেই স্বমহিমায় নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন।

শ্রুতি বলেনঃ-

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি

আনন্দমভিসং বিশন্তি।

এইভাবে উক্ত চতুর্ব্বিধ কোষ কেবল আনন্দ সংকল্পে আত্মায় কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং সংকল্পই আত্মার সর্ব্বশেষ আবরণ। সংকল্পক্ষয়ে আত্মা কোষমুক্ত হইয়া যায় এবং স্বরূপে অবস্থান করে।

শালগ্রাম তত্ত্ব

বা

শিলাপূজার তাৎপর্য্য

ঃ আত্মানং বিদ্ধি ঃ

আত্ম পরিচয়ের পথে ঋষি শিল্পে সর্ব্বজনবিদিত প্রতীক রহিয়াছে "শালগ্রাম"। আমাদের হৃদয়-স্বামী শ্রী শ্রী ভগবানের অর্চ্চনা করিতে হয় ইহাতে।

শালগ্রাম কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার শিলা বিশেষ। ইহার মধ্যদেশ ছিদ্র সংকুল ও অভ্যন্তর ভাগ স্বর্ণরেখা পরিশোভিত। এই শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া আমাদের আপামর জনসাধারণ, কিভাবে চিৎসত্ত্বার পরিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিব, তাহারই সময়োচিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন।

ইহার নাম, রূপ ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিতে যাইয়া আমরা প্রথমতঃ দেখিব, - এই বিশিষ্ট শিলাচক্রকে শালগ্রাম আখ্যায় আখ্যায়িত করিবার কারণ কি?

শালগ্রাম পদটি যোগরূঢ়। শাল ও গ্রাম এই শব্দদ্বয়ের সংযোগে একটি বিশিষ্ট বস্তু বুঝাইতে শালগ্রাম পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। শাল শব্দের অর্থ হইতেছে-আবরণ।

"প্রাকারো বরণ; শাল ইত্যমরঃ।"

আর গ্রাম শব্দের অর্থ হইতেছে-অনেক। যদ্যপি গ্রাম শব্দ বহুজনের নিবাস স্থলকে বুঝায় তথাপি-"শব্দাদি পূর্ব্ব বৃন্দেহপি" এই সূত্র অনুসারে গ্রাম শব্দ শালশব্দের পরবর্ত্তী হইয়া বসায় ইহার অর্থ হইতেছে - অনেক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন গুণগ্রাম অর্থে গুণরাশি, ভূতগ্রাম অর্থে ভূতরাশি। এইবার উক্ত শব্দ দুইটির যৌগিক অর্থে আমরা পাইতেছি, যাহাতে অনেকটি আবরণ রহিয়াছে তাহারই নাম-শালগ্রাম। কেহ কেহ গ্রাম শব্দের অর্থ করেন, "অবস্থা বা স্তর।" এইরূপে অর্থ হয়, যাহাতে অনেকটি স্তর আছে-তাহাই শালগ্রাম। সঙ্গীতশাস্ত্রে ছন্দোজ্ঞাপক স্বরলিপিতে শব্দ কম্পনের অবস্থা বিশেষকেও গ্রাম বলা হয়।

আমরা শালগ্রাম পদের কেবল শব্দগত অর্থ বিচার করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব না। যাহাতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয় তাহারই চেষ্টা করিব।

ব্রহ্ম নির্গুণ। ইনি যাহাকে আশ্রয় করিয়া সগুণ ভাব ধারণ করেন, অনন্ত জীব-অনন্ত জগৎরূপে প্রকাশিত হন, আপনার পরম সত্যরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহাই তাঁহার আবরণ, তাহাই শালপদ বাচ্য। আর যাহার প্রকাশে অতচিতে

শুচিবোধ, দুঃখে সুখ জ্ঞান, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি ও অনাত্মায় আত্মধারণা রূপ যে ভ্রম জন্মে, তাহাই তাঁহার বিভূতি, তাহাই সমষ্টিগত মায়া। আবার তাহাই ব্যষ্টি জীবগতা, আবরণ স্বরূপা-পঞ্চ কোষাত্মিকা অবিদ্যা। ইহাই গ্রাম পদবাচ্য। অনন্ত জীব, অনন্ত অবিদ্যা। তাই মায়া একাকিনী হইয়াও অনন্তা। ইহা বুঝাইবার জন্য কেবল বহুত্ববাচী শব্দান্তর গ্রহণ না করিয়া, অবস্থা জ্ঞাপক ও বহুত্ববোধক গ্রাম শব্দ শাল শব্দের পরে সুচিন্তিত ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, - মায়া উপহিত চৈতন্য অধ্যয়নই শালগ্রামপূজায় আমাদের অধিগম্য বিষয়।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপে অবস্থিত অবস্থা-ত্রয়ই মায়ার ত্রিবিধ গ্রাম বা ত্রিবিধ স্তর। বেদান্তের ভাষায় স্থূলকে অন্নময় কোষ, সূক্ষ্মকে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এবং সর্ব্বশেষ কারণকে আনন্দময়রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপী মায়াকূটে উপহিত চৈতন্যঘন সত্ত্বাই যে শালরূপী শালগ্রাম, - ব্যষ্টিভাবে প্রতিটি জীব আবার তাহাই যে সমষ্টিভাবে জীবঘন নিখিল বিরাটরূপে সম্ভূত; ইহা সাধকমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। উক্তরূপে শালগ্রাম রহস্য ক্রমশঃ উদঘাটিত হইতে থাকিলে প্রতিটি বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহের অবকাশ আর থাকেনা এবং প্রতি জিজ্ঞাসায় সদুত্তর পাওয়া যায়।

বেদান্ত বলেন; - "তদেজতি তন্নৈজতি"।

তিনি সচল, তিনি অচল।

তিনি কম্পন দান করেন, অথচ তাঁহাকে কেহই কম্পিত করিতে পারেনা। তাঁহারই কম্পনে-তাঁহারই ছন্দে, তাঁহারই লীলা বিলাসে, ত্রিজগৎ গুণময় বিবিধ সৃষ্টি স্তরে স্তরে অত্যাশ্চর্য্য ভাবে উত্থিত হইয়াছে। কাজেই এই কম্পনের অপর নাম মায়া বা প্রকৃতি। "ছন্দাংসি বৈজগৎ"।

এই মায়া উপহিত অবস্থায় অনন্ত জীবোপাধি দৃষ্ট হয়। সুতরাং জীবকে তাহার স্বরূপ জানিতে হইলে, -"আমি-কি", এইরূপ সত্যজ্ঞানে উত্থিত হইতে হইলে তাহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ এক একটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় রূপ এক একটি আবরণ উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। এইভাবে ব্যষ্টিভাব অতিক্রম করতঃ সমষ্টিভাবে পদার্পণ করিতে পারিলেই, তবে স্বরূপ আয়ত্ত্ব হইতে পারে; নতুবা স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং প্রত্যেক সাধক ঐ আবরণ পরম্পরার সম্মিলিত অবস্থা-স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরকে তত্ত্বজ্ঞান লাভের ত্রিবিধ অন্তরায় জানিয়া উহাদের যথার্থ নাম দিয়াছেন - ত্রিকুট।

এই ত্রিকুট অতিক্রম করিবার মত যথোপযুক্ত অবস্থা - আমাদের মানব যোনি প্রাপ্ত হইতে কতশত জীবনের পুঞ্জীভূত

ব্যথার নিদারুণ নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। সে যাহা হউক নানা যোনি ভ্রমণে ব্যস্তমতি জীবের যখন ভাগ্যোদয় হয়, মানব আকার প্রাপ্ত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করে, বস্তুতঃ সে মানব হয়; তখন সস্তবপ্রভাবে তাহার বিলক্ষণ ধারণা জন্মে যে, - স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ দেহরাজি দ্বারা-পঞ্চকোষাত্মক আবরণ পরম্পরা দ্বারা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় সে চির আবদ্ধ, তখনই সে স্বকীয় স্বরূপ অবধারণ করিতে প্রয়াস পায় এবং ইহার প্রতিকূল বিষয়রাশি পরিহার করিতে প্রাণপাত যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু দেখে তাহার সব চেষ্টাই বিনাশোন্মুখী, যাহা অবলম্বন করে তাহা অলক্ষ্যে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কিছুতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি, - স্বরূপ সন্ধান আর হয় না।

কাহাকে অবলম্বন করিলে বিষয়টি সহজে আয়ত্ব হয়, তাহার নিখুঁত গবেষণার ফল স্বরূপ চাক্ষুষ বিদ্যা দৃষ্টি শিল্প ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ইহা ত্রাটক নামধেয় অপরিহার্য্য যোগাঙ্গ বিশেষ। ঋষিগণ এই অদ্ভুত দৃষ্টি-বিজ্ঞান ত্রাটক দৃকশক্তি বাড়াইবার জন্য, ব্যবহিত বা দূরস্থ বস্তুদর্শন করিবার জন্য, আকাশ বিহারী অমানব প্রাণী-সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদি দর্শন করিবার জন্য, চাক্ষুষ আলোককে আয়ত্ব করিয়া নিদ্রা-তন্দ্রাদি অশেষবিধ চক্ষুদোষ নিবারণ করিবার জন্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এবং এতৎ প্রসঙ্গে তাঁহারা এমন

কতকগুলি প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক আচার সহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিধিরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাহার অনুধাবন করিলে সহজে ও সহসা কেবল যে ত্রাটক আয়ত্ত হয় এমন নহে, পরন্তু ঐ নিয়মিত চাক্ষুষ আলোকের সহিত শ্বাস স্থির হইয়া মন স্থির হইয়া যায়। ফলে লাভ হয়, চির আকাঙ্খিত স্বরূপের অনুভব অতীন্দ্রিয় অবস্থা -

ঐ আনন্দ--ঘন চিৎ।

ঋষিযুগ চলিয়া গিয়াছে সে অনেকদিন, আজ আমরা উদ্দেশ্যহীন; উদ্দেশ্যজ্ঞান না থাকাতে ঋষি প্রদর্শিত উপায়ে যথার্থ ফলভাগী হইতে পারি না। আজন্মকাল ধরিয়া আমরা স্নানের সাক্ষী ফোঁটা কাটিয়া থাকি। আর উপাসনার সাক্ষী শালগ্রামে নারায়ণ অর্চ্চনা করিয়া যাই; তথাপি ত্রাটক কি তাহা আমরা জানিনা। আমরা ত্রাটকফলে বঞ্চিত, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? ভাবিয়া দেখিল বৈষ্ণবেরা যে আ-নাসাগ্র রস-কলি তিলক কাটেন, আর সন্ন্যাসীরা ত্রিপুণ্ড্রসহ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করেন এবং ব্রাহ্মণেরা শালগ্রাম শিলা চক্রাধিষ্ঠিত স্বর্ণ-গর্ভ স্থানে নারায়ণ অর্চ্চনা করিয়া যান, তাহাই ত্রাটক সাধনার উত্তম অবলম্বন। ইহা অবলম্বিত হইলে ত্রাটকসাধনায় সাধারণ ফললাভ হয়,-

"নাসাগ্রং দৃশ্যতে যেন পদ্মাসন গতেনবৈ।
মনসো মরণং তত্র খেচরত্বং প্রসিধ্যতি।।"

শিব-সংহিতা

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া যিনি নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার মনোলয় নিবন্ধন খেচরত্ব লাভ সিদ্ধ হয়।

এইরূপে ঋষি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনের গুপ্তরহস্যকে জনসাধারণে পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ত্রাটক পদ্ধতির সাধারণ নিয়মগুলি হইতেছে এইঃ-

১। নাসাগ্রদর্শন,

২। সজ্যোতিঃ বস্তুর আরোপ,

৩। নেত্র প্রীতিকর সূক্ষ্ম লক্ষ্য গ্রহণ।

সমগ্র দৃষ্টিকে পুঞ্জীভূত করিয়া, স্থান হইতে স্থানান্তরে বিনিয়োগ করিবার জন্য যে অধ্যারোপ-বাদ এইরূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহারই মর্মকথা জানিতে না পারিয়া, আমাদের অনেকেই শালগ্রামে নারায়ণ অর্চ্চনারূপ প্রাচীন প্রথাকে, তথাকথিত ব্রাহ্মণের লোক-ঠকানো ব্যবসায় আর সাধু বাবাজীদের তিলকদান ব্যাপারকে ভেকবাদের মিথ্যা-মোহময় আড়ম্বর মাত্র মনে করিয়া থাকেন; ইহা একান্ত অশোভন। ঋষি সন্ততির ঋষি-শিল্পে অবাঞ্ছিত অনাদর পোষণ করা অতীব

আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা আত্ম-হননেরই অনুরূপ। আত্মঘাতী নীতি জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলে ইহা কে না জানে? তবে আচারের নামে যে শত শত অনাচার দিকে দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, যাহা আমাদের শাস্ত্রসম্মত নহে, যাহা এতাবৎকাল ধরিয়া হিন্দু সমাজকে ক্ষয়োম্মুখী করিয়া দিয়াছে এবং জগদ্দল পাষাণের ন্যায় এখনো সমাজের বুকে বিরাজমান, ঐগুলির উচ্ছেদ সাধন সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। উহাদের উৎখাত করিতে হইবে। সম্ভবপর হইলে বেদানুমোদিত পন্থায় উহাদের পুনঃ সংস্কার সাধন করিয়া সনাতনধর্ম্মের পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আশা করি ইহা আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একান্ত কামনার বস্তু। জাতীয় জীবনের অগ্রদূতরূপে যাঁহারা আমাদের পুরোভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহাদের উপর ঐ গুরুভার কর্ত্তব্য হিসাবে সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে ন্যস্ত হওয়া উচিত। আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি. আমরা কি প্রার্থনা করি-

"দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য চক্ষুষা
সর্ব্বানি ভূতানি সমীক্ষান্তাম্
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বানি ভূতানি সমীক্ষে,
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।।

যজু ৩৬। সংস।

হে সর্ব্ব দুঃখহারিন্ পরমেশ্বর, আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন যেন আমরা পরস্পর বৈরভাব ত্যাগ করিয়া পরম প্রীতিভাবে অবস্থান করিতে পারি। জীব মাত্রই যেন আমাকে তাহার বন্ধুজ্ঞানে আমার সহিত বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করে। আমি যেন সকলকে মিত্রজ্ঞানে সকলের সুখ দুঃখ লাভালাভ প্রভৃতিতে সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি এবং আত্মবৎ প্রেমবুদ্ধিতে সর্ব্বজীবকে নিরীক্ষণ করি।

আশা করি প্রাত্যহিক প্রার্থনার বিষয়বস্তু হইবে এইরূপ, আমাদের ছিন্নভিন্ন সৌভ্রাত্র বন্ধন যেন পুনরায় সংহত হয়, যেন আমরা পুনরায় সমস্বরে বলিতে পারি, -

"জীবা জ্যোতিরশীমহি"

প্রভো! আমরা যেন তোমার অনন্তশক্তি সমবেতভাবে ভোগ করি।

সে যাক, আমরা অনেকদুর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত।

তাই বলিতেছি-যাঁহারা ভাগ্যবান বহুজন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল-সদগুরুকৃপা পাইয়াছেন এবং তাঁহারই কৃপায় স্বকীয় হৃদয়ে চেতন আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিদিতবেদ্য হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন, আমাদের এই চেতনসত্ত্বা, সৈন্ধব শিলাখণ্ডের ন্যায় অচল,

নীরন্ধ্র ও একরস। ইহা সর্ব্বান্তর, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত সত্য। তাই নিকটে, কিন্তু চেতিত অর্থাৎ প্রকাশিত স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ ত্রিবিধ মায়া প্রাচীর দ্বারা আবৃত, পঞ্চকোষাত্মক আবরণ পরম্পরা দ্বারা আচ্ছন্ন; কাজেই স্থূল দৃষ্টিতে তিরোহিতের ন্যায় ধারণা হয় এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অত্যন্ত ধুরগত বস্তুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বান্তর চেতনসত্ত্বার তত্ত্বানুসন্ধান যেমন একদিকে দুর্ব্বিজ্ঞেয়, ঠিক তেমনই অন্যদিকে চৈতন্যের আবরণ, এই ব্যক্তমায়ার স্বরূপ নিরূপণ করাও আমাদের পক্ষে দুর্বিভাব্য হইয়া উঠে।

আমাদের মনোবুদ্ধি খণ্ডখণ্ড জড়রূপের ভাবনায় এতটুকু অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে সে কিছুতেই তাহার এই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া ঐ অনন্তের দিকে লক্ষ্য দিতে চায় না বা পারে না; কেননা তাহার বাস্তব ধারণা অতটুকু নাই। তাই তাহার ততটুকু শক্তি হয়না। এইরূপে মায়া নিরূপণ চিরতরে যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যায়। উহা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তমোরূপ। এই যে তিমিরবরণ অখণ্ড মণ্ডলাকার শিলারূপ, ইহাই তাঁহার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

ইহাতেই ঐ তত্ত্বকথা নিহিত রহিয়াছে। চিন্তা করিলে প্রত্যেক মনীষী ইহা স্বীকার না করিয়া পারেন না। পক্ষান্তরে পূর্বকথিত হৃদয়স্থানে আসিলে অমারজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের ন্যায় যে অখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতিঃ সাধকের দৃষ্টি-মুখে দীপ্তি পাইতে থাকে তাহাই ব্যক্তমায়ার অব্যক্ত স্বরূপ।

ইহা শক্তিজ্যোতিঃ। এইরূপ সত্যবিজ্ঞানও লাভ হয়। পুনরায় গুরুপদিষ্ট মার্গে ঐ কৃষ্ণজ্যোতির মধ্যকেন্দ্রে অন্তর লক্ষ্য ও বহির্দৃষ্টিতে অবস্থিত হইতে পারিলে উহারই মহাকুক্ষিতে অনন্ত জ্যোতিঃরাশি বিস্ফুরিত হইতে দেখা যায়, অতএব ইহারই নাম-হিরণ্যগর্ভ।

হিরণ্যগর্ভ শালগ্রামই ঐ অবস্থার মূর্ত্ত প্রতীক। হিরণ্য শব্দ বেদে জ্যোতির্বাচী, লৌকিক অর্থে ইহা সুবর্ণ। বস্তুতঃ এই শালগ্রাম শিলার অভ্যন্তরেও সুবর্ণ রেখা রহিয়াছে। ঋষি এই হিরণ্যগর্ভ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বলিয়াছেন,-

'হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তৎত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে"।

হে ভগবন্! সর্ব্বভাবে সর্ব্বজীবের তুমিই একমাত্র পোষণকারী। তুমি সত্যস্বরূপ, আমি সত্যধর্ম্মা মানব। তোমার মুখমণ্ডল অতি ভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় আবরণ দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে আমি একান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। প্রভো! তুমি আমার প্রতি কৃপাবিতরণ করিবার নিমিত্ত দৃষ্টি প্রতিঘাতী তোমার ঐ ভাস্বর মুখাবরণ উন্মোচন কর। আমি তোমাকে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করি। তোমার অনাবৃত মুখমণ্ডল অবলোকন করিবার ফলে আমি যেন সর্ব্বত্রে সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া যাই।

অনুভূতির রাজ্যে যাঁহাদের এইরূপ সত্যদর্শন দ্বার খুলিয়া

যায়, তাঁহাদের কথা আর বলিব কি? তাঁহাদের স্বভাব অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়, তাঁহারা নিষ্প্রয়োজনে কোন কথা বলেন না বা বলিতে চাহেন না। অথবা জিজ্ঞাসিত হইয়াও অগত্যা স্বল্পকথায় সমগ্র উত্তরটি প্রদান করিয়া নিবৃত্ত হইয়া যান এবং উপদেশচ্ছলে বলিয়া থাকেন -

"অন্যাবাচো বিমুঞ্চত।"

নিষ্প্রয়োজনে বলিতে নাই। কিন্তু বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ঐ নিরঞ্জন চিৎ সত্ত্বার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিয়া উহারই অভ্যন্তরে নিশ্চলা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ আকাশে বিপুল অনিলের ন্যায় অবস্থিত ত্রিজগৎ অবলোকন করেন। যদ্যপি চিৎ শিলা-ঘন বলিয়া নিরবকাশ অর্থাৎ নিরন্ধ্র, এমন কি সামান্য রন্ধ্র পর্য্যন্ত ইহাতে নাই, তথাপি যে ত্রিজগৎ ইহাতে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছে, তাহা অস্তি নাস্তি উভয় প্রতিভাত হইয়া আকাশে কাঞ্চন কণার অস্তিত্ব প্রকাশ করে অথচ উহাতে কাঞ্চন কণার বস্তুতঃ অস্তিত্ব নাই; ঐ নিত্যচেতন স্বরূপেও জগৎসত্ত্বা তদ্রূপ, অস্তি নাস্তি দ্বিভাবে বিরাজিত। ইহাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রাহ্মী শক্তির অচিন্ত্য মহিমা। ব্রহ্ম স্ববিষয়ে সংবেদনময় হইয়াই (নিজকে নিজে জানিতে যাইয়াই) কেবল এইরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন।

শ্রুতি বলেন, -

যত্তদ্ অদেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃ-

শ্রোত্রং তদ্ অপানি-পাদং নিত্যং বিভূং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদ্ অব্যয়ং অদ্ভুত-যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।

যিনি ভূত সকলের যোনি-পরমেশ্বর, [বিবেকী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি অপাণিপাদ, অচক্ষু-শ্রোত্র। অনির্দ্দেশ্য নিত্য সর্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয়, অতএব ইনি অতীন্দ্রিয় অনির্বচনীয় অখণ্ড আত্মা। "তদৈক্ষত" "তৎসর্জ্জন্ অভবৎ" - তিনি| ঈক্ষণ করিয়া অর্থাৎ বোধে বোধ করিয়া নিজেই সর্ব্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি ব্রহ্ম যখন সংবেদনময় হন অর্থাৎ দ্বিতীয় শূন্য আত্মপ্রত্যয়সার নিজেকে দেখিতে পান, তখনই সৃষ্টি সংকল্পে উদ্বোধিত হন; তখনই বিশ্বলীলার অভিনয়মঞ্চে বিচারপূর্ব্বক ব্যাপক মায়ামূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ফলে তাঁহার নির্ব্বিশেষ ঐ এক আত্মপ্রত্যয়-সার, পারমার্থিকরূপে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ক্রিয়ার উদ্রেক হইতে আরম্ভ হয়। যথা-বদন্ বাক্, শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্, পশ্যন্ চক্ষুঃ মন্বানো মনঃ, - তিনি কথা কহিয়া বাকশক্তি হইলেন শ্রবণ করিয়া শ্রবণশক্তি হইলেন, দর্শন করিয়া দৃষ্টিশক্তি হইলেন এবং মনন করিয়া মনঃশক্তি হইলেন। ঈক্ষণক্রমের উক্তরূপে বিশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াই প্রতিটি অবয়ব রচিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার রূপ। এই বিশিষ্ট রূপের বাচক শব্দই নাম। কাজে কাজেই অনন্তরূপে, অনন্ত নামে উপহিত হওয়াই জগৎ।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রূপায়িত অস্তি, ভাতি ও প্রীতিরূপে ঈক্ষণের প্রতিটি বিশিষ্টতা বোধে যে চমৎকারিতাময় সৃষ্টি, যাহা আমরা অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ সত্যরূপে পাইতেছি, যাহা আমাদের বহির্মুখী ইন্দ্রিয় গ্রামের গোচরে আসিয়া নিত্য ভাসিতেছে তাহাই অচিৎ দর্শন - তাহাই জড় জগৎরূপে প্রতিভাত। ইহাই সর্ব্বান্তর ব্রহ্মশিলার সর্ব্ববাহ্য ব্যাপক মায়ারাজ্যরূপে অবিস্থিতি। তাই ইহার নাম - "বিষ্ণুচক্র"।

ইহা মায়া উপহিত অবস্থা। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গুরুগণ দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিবৃন্দ সাংখ্য, যোগ, তপস্যা, বৈরাগ্য ও ভক্তিপ্রভাবে মায়া নির্মুক্ত অবস্থা - বিষ্ণুর সেই পরমপদ দর্শন করিয়া সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"তদবিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ

দিবীব চক্ষুরাততম্"।

ঋগেদ - ১/২/৭/৫

সর্ব্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট বিষ্ণুর পরমপদ-যাহা উত্তম আনন্দ-স্বরূপ, যাহা একমাত্র প্রাপ্তির যোগ্য, মুক্তির হেতু, সূরিগণ অর্থাৎ যোগী মহাপুরুষেরা স্বকীয় হৃদয়ে মেঘমুক্ত আকাশে অবাদ-প্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় নিত্য অবলোকন করিয়া থাকেন। কাজেই বিষ্ণুর পরমপদ দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইবার নহে, অর্থাৎ ইনি অমুক দেশে আছেন, এই দেশে নাই,

নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনাসক্ত পশুর সমপর্য্যায়ে আমাদের নামিয়া আসিতে হয়।

অতএব লোকমঙ্গল ঋষি এই প্রাকৃত জগতের মধ্য দিয়ে ঐ অপ্রাকৃত সত্তার বিমলজ্ঞান আহরণ করিবার সুগম উপায় উক্ত ধ্যান বিধি সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ঐ যে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধর চতুর্ভুজ কিরীটধারী হারশোভিত হিরন্ময়বপুঃ ইহা সেই নির্লেপ, নিরঞ্জন, নিরবদ্য, নির্গুণ **অনন্ত স্বরূপেরই অচিন্ত্য—গুণ—প্রোদ্‌ভিন্ন রূপ**। এই অচিন্ত্যগুণময় রূপ আমাদের ন্যায় কদাচ প্রাকৃত গুণময় নহে-ইহা গুণাতীত। কাজেই শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারণ অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিবার উপযোগী সিদ্ধান্তপ্রদ অত্র সংগৃহীত উপলক্ষণ মাত্র, আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা অতি পরিষ্কাররূপে অবগত হওয়া যায়। শঙ্খ-এক ধ্বনিবাহী নাদ যন্ত্র। একাক্ষর ওঁ নিনাদিত হয় শঙ্খে। আমাদের অন্তরে যে ধ্বনি নিরন্তর অনাহতভাবে ধ্বনি হয়, - ঋষিরা বলেন, তাহাই নাদ ব্রহ্ম ওঁ। এই ওঁ নিত্য নব নব আকারে আকারিত হইয়া দৃশ্যমান অনন্ত বিশ্বরূপে রূপায়িত হইয়াছে। তাই জড় চেতনাময় প্রতি বস্তুর অন্তরে রহিয়াছে এক ধ্বনিময় ও প্রকাশক চিদাকাশ আর বাহিরে রহিয়াছে বহু ধ্বনিময়ব্যোম্ এই মহাকাশ। ব্যোম্ - ওঁ-এরই বিশিষ্ট রূপ অর্থাৎ বহুবিধ শরীর রচনার ক্ষেত্র। এইভাবে আমরা দেখিতেছি তৃণগুল্মাদি হইতে আরম্ভ করিয়া

মহামহীরুহ পর্যান্ত, এবং কৃমি কীট হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদেহ পর্য্যন্ত সেই সেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিত্য নব অনন্ত আকারে অনন্তগুণে প্রকৃষ্টভাবে আকারিত হয় বলিয়া এই ওঁ কারের শাস্ত্র সম্মত যথার্থ নাম রহিয়াছে প্রণব। অথবা ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের স্তব করা যায়, অতএব ইহাকে প্রণব বলা হয়। প্র(প্রকৃষ্টেন) নূয়তে স্তূয়তে অনেন ইতি প্রণবঃ। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

যোগশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জল বলেনঃ-

অনন্ত দেবনময় (ক্রীড়াময়), অনন্ত বেদনময় (জ্ঞানময়) ও অনন্তদ্যুতিময় (জ্যোতির্ম্ময়) ভগবানের একমাত্র সত্যনাম হইতেছে প্রণব-ওঁ। নাদ ব্রহ্ম এই ওঁ সৃষ্টি সঙ্কল্পে প্রকাশিত হয় ঐ চিদ্ আকাশে, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে। শম্+খ=শঙ্খ। শম্ অর্থে মঙ্গল বা নিবৃত্তি এবং খ অর্থে আকাশ। নিবৃত্তি মূলক চিদাকাশই জীবের মঙ্গল দায়ক। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি মূলক এই মহাকাশ জীবের পক্ষে অশেষ দুঃখ দায়ক। শঙ্খ পদের দ্বারা ইহা উপলক্ষিত হয়। সর্ব্বগ আত্মায় চিদাকাশ চেতিত অর্থাৎ সৃষ্টিকালে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহার নাম চিদ্ ও অনন্ত সৃষ্টিকে আপন বুকে অবকাশ দান করে বলিয়া ইহার অপর নাম আকাশ। আকাশ সমস্ত নাম ও রূপের নির্ব্বাহক। ইহা শব্দগুণ। সর্ব্বশব্দের মূলে রহিয়াছে ওঁ। ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হয় ঐ চিদ্ আকাশে।

চিদ্ আকাশ শুভ্র আত্মলোকে সমুজ্জ্বল। কাজে কাজেই এক-ধ্বনিবাহী শুভ্র চিদ্ আকাশ ঋষি শিল্পে ওঁ নিনাদী চন্দ্র ধবল শঙ্খরূপে অনুকল্পিত হইয়াছে। চিদ্ আকাশ সঙ্কল্পের আধার। সঙ্কল্পে চিত্ত-আকাশ ও চিত্তাকাশে মহাকাশ প্রকাশিত। ইহারা মায়া কল্পিত সুতরাং দুঃখময়, কিন্তু চিদ আকাশ মায়ামুক্ত-সুখের হেতু। অতঃপর শঙ্খরূপে আকারিত ঐ সর্ব্বগামী সুখময় চিদ্ আকাশ ধারণকারী বিষ্ণু যে কত মহান, - মহতোমহীয়ান্ ও কত নিত্য সুখময়, তাহা ভাবিবারই বিষয়। এইভাবে ভাবময় কল্পিত এক একটি রূপের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমরা অনন্ত অচিন্ত্য তত্ত্বে অবগাহন করিবার সুযোগ পাই। সুদর্শন চক্র-বাৎসল্যরস-প্রবণ প্রেমময়ের প্রেমময় ঈক্ষণই সুদর্শন। অনন্ত-জগতে অনন্তভাবে ভাবিত জীবের পরিরক্ষণে, প্রতিপালনে ও পোষণে তাঁহার যে কৃপাপুরিত দৃষ্টি ইহাই সুদৃষ্টি, ইহাই সুদর্শন। ইহার ফলে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী অনন্ত জীবের আহার বিহারাদি বাঞ্ছিত লাভ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সহিত রীতিমত নিয়মিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার সুদৃষ্টি সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের পক্ষে সুখময় ও শোভন বলিয়াই ইহার নাম সুদর্শন। কিন্তু এই "সুদর্শন" চক্ররূপে রূপায়িত হইয়াছে।

দিকে দিকে অবস্থিত অনন্তজীবের পরিরক্ষণে নিত্য পরিচালিত তাঁহার সুদৃষ্টি, প্রহরীর ন্যায় প্রতিটি জীবকে

প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করিতে বারংবার আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাই অনন্ত জীবে জীবে নিরন্তর আবর্ত্তিত তাঁহার এই সুদৃষ্টি, ঋষি শিল্পে সুগোল চক্ররূপে আকারিত হইয়াছে।

আমরা আরও দেখিতেছি, - মর্য্যাদা ধ্বংসকারী দুষ্টজনের শাসনে সুদর্শন নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছে। দুষ্টের দলন শিষ্টের পালনই তাহার কর্ম, ইহাতেই তাহার তৃপ্তি। অতএব ইহার নাম চক্র। তৃপ্তিবাচক চক্ ধাতু অথবা কর্মবাচক কৃ ধাতু হইতে চক্র শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অনন্ত কৃতি শক্তির পরিচায়ক সুদর্শন ভক্তত্রাণ ও দুষ্টদলন অস্ত্র হিসাবে এইভাবে ধন্যনামধন্য। এইভাবে অনুধাবন করিতে থাকিলে আমাদের জ্ঞান হয় বিষ্ণুই সর্বময় সর্বকর্তা, সর্বজীবের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ। তিনি ভিন্ন জীবের দ্বিতীয় শাসক বা পালক নাই। তিনি ন্যায়কারী, পরমদয়ালু এবং কদাচ অন্যায়ের প্রশ্রয় দান করেন না।

গদা-প্রহরণ বিশেষ। যাহার প্রহারে প্রহৃত বস্তু চূর্ণীকৃত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহাই গদা। গ অর্থে গতি, দা অর্থে ছিন্নকরা বা দান করা। যাহার আঘাতে মায়া চক্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সংসার গতি ছিন্ন হইয়া যায় পক্ষান্তরে পরমা গতি প্রদান করিয়া থাকে, গদা সেই মহীয়সী শক্তির একমাত্র মূর্ত প্রতীক। মায়াভ্রান্তি-নাশিনী এই গদা জীবকে ব্রহ্মানন্দ প্রদানে পরমাশান্তি দিয়া থাকেন। তাই বিষ্ণুর করস্থিত এই গদার

যথার্থ নাম কৌমুদকী অর্থাৎ জগদানন্দদায়িনী বিষ্ণুই গদাধর। ইহা তাঁহার চির প্রসিদ্ধ নাম। এইভাবে গদা তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা জানিতে বা বলিতে পারি, - মুক্তিদায়িনী শক্তি একমাত্র তাঁহারই করতলে। কাজেই মুক্তি পাইতে হইলে বিষ্ণুরই শরণাগতি লাভ করিতে হয়। অতএব বিষ্ণুই জীবের শরেণ্য, জগদ্‌বরেণ্য সম্ভজনীয় পরমতত্ত্ব।

পদ্ম-মধুর সৌন্দর্য্যে, মনোরম গন্ধে, কোমলতায় ও স্নিগ্ধতায় নয়নানন্দকর, পদ্ম প্রত্যেকেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা ঐশ্বর্য্যের অধিদেবতা লক্ষ্মীর আবাসভূমি। এই পদ্ম বিষ্ণুরই করে। অতএব দেখা যায়, বিষ্ণু পদ্ম লক্ষিত তৎ তৎ সর্ব্বগুণে পরিভূষিত হইয়াই মনোহারী, সর্ব্বজনপ্রিয়, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, নিত্য দিব্য গন্ধে আমোদবান্‌ ও চিরসুন্দর। জীবের প্রার্থিত বস্তু, - সমস্ত ধনের দাতা একমাত্র তিনি। পদ্ম ধারণের তাৎপর্য্য অধ্যয়ন করিতে গিয়া আমরা পাই, তিনি ভিন্ন অন্য দাতা নাই। বিশেষতঃ পদ্মধারণের গূঢ় তাৎপর্য্য অধ্যয়নে ইহাও জানা যায় যে বিষ্ণু সর্ব্বাধিনায়ক।

পদ্+ম=পদ্ম। পদ্ অর্থে প্রতিষ্ঠা বা আধিপত্য এবং ম অর্থে ব্রহ্মা ও হরকে বুঝায়। ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যে ও হর সংহরণ কার্য্যে নিযুক্ত। ইহারা যাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া সৃষ্টি ও সংহার কার্য্যে অপ্রমত্ত চিত্তে নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং যাঁহারই

কৃপায় ঐ সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে অধিষ্ঠিত, তিনিই সেই হিরণ্ময় বপু অর্থাৎ অনন্ত জ্যোতির আধার সর্ব্বাধিনায়ক জিষ্ণু সর্ব্বলোকের অধিপতি দেবদেব পরাৎপর ভগবান বিষ্ণু। অতএব অনন্তবীর্য্য, অমিতদ্যুতি বিষ্ণুর স্থাপিত মর্য্যাদা অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তাঁহারই ভয়ে, তাঁহারই অলঙ্ঘ্য শাসনে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হইয়া থাকে, ইন্দ্র ও চন্দ্র স্ব স্ব কর্ম্মে নিত্য ব্যবহিত রহিয়াছে এবং মৃত্যু জগতে নিয়ত পরিভ্রমণ করে।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।

ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।।

(তৈত্তিরীয় ব্র, ৮)

কনক কুণ্ডল, কেয়ুর ও কিরীট, রাজ-রাজেশ্বর রূপের একমাত্র পরিচায়ক নিদর্শন। ইহারা তাঁহার সার্ব্বভৌম রাজোচিত মহাঐশ্বর্য্যের এক একটি প্রতীক, ইহাতে সন্দেহ নাই। বেদ বলেন, - প্রসম্রাজম্ চর্ষণীনাম্। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত প্রাণীর তিনি এক নায়ক-সম্রাট্।

মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও হীরক সবর্ণা বিষ্ণুর যে বৈজয়ন্তী নামিকা পঞ্চবর্ণের প্রভাযুক্তা মালা রহিয়াছে, তাহা পঞ্চতাত্ত্বিক জ্যোতিরই অপূর্ব্ব সমুচ্চয় স্বরূপ। ইহা তাঁহারই হৃদয় শোভা। ইহার দ্বারা আমরা সাধারণের অদৃশ্য সেই পঞ্চবিধ তত্ত্ব জ্যোতিরই কথা স্মরণ করিতে পারি। যোগীদের জ্ঞানোজ্জ্বল দিব্যদৃষ্টিতে শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত সবুজবর্ণের যে পঞ্চবিধ মনোরম জ্যোতি প্রকাশিত হইতে থাকে, তাহা তাহারই তাত্ত্বিকজ্যোতি। ইহারা পঞ্চ মহাভূতের সুসূক্ষ্ম রূপ, যাহাদের নাম তন্মাত্রা। বিচিত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনার একমাত্র উপাদান কারণ ইহারাই। ইহাদের অনন্ত অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় সংযোজন পরিকল্পনার দ্বারা বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে পরস্পর বিলক্ষণ অনন্ত জীবের ভাবময় অনন্ত বিভিন্নরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে আমরা বুঝিতে পারি, জগদ্ বিধাতার মহিমা অচিন্ত্য; জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া তাঁহার স্বাভাবিক। তিনি অঘটন ঘটনকারী; মায়ার অধিপতি; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত যাবতীয় শক্তির একমাত্র নিয়ন্তা; ভূতভবিষ্যদ্ বর্তমানের অদ্বিতীয় ঈশান; সর্ব্ব প্রভবিষ্ণু বিভুবিষ্ণু।

বিষ্ ব্যাপ্তৌ, বিষ্ ধাতু নু প্রত্যয় করিয়া বিষ্ণু পদটি সাধিত হয়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজীবের অন্তরে অন্তর্যামী, আত্মার আত্মারূপে অনুপ্রবৃষ্ট, সৃষ্ট তৎ তাবৎ বস্তুর অতীতে,

অপ্রাকৃত তত্ত্বরূপে স্বধামে নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন তিনিই বিষ্ণু। তিনিই "নারায়ণ"।

নার+অয়ণ=নারায়ণ, অনন্ত জীব সমষ্টির আশ্রয় পালন ও পোষণকারী। ইনি সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী। আকাশে পরিদৃশ্যমান ঐ সূর্য্য সবিতৃমণ্ডল নহে, ইহা ব্যষ্টি সূর্য্য। আমাদের এই সূর্য্য এই সৌরজগতেরই একমাত্র প্রকাশক সবিতা, কিন্তু অনন্ত সৌরজগতের প্রসবিতা নহেন। অত্র সবিতৃমণ্ডল পদে অনন্ত জগতের অনন্ত সূর্য্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মণ্ডল বহুত্ববাচী শব্দ। ঋষি আমাদের দৃষ্টিকে অনন্তে সম্প্রসারিত করিয়া পরম সত্যের বিমলজ্ঞান জন্মাইতে সমষ্টিবাচক মণ্ডল শব্দ গ্রহণ পূর্ব্বক অতি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন,-"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ", অনন্ত সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণকে নিরন্তর ধ্যান করিতে হইবে।

গ্রহ উপগ্রহ শোভিত প্রতিটি সৌরজগৎ সূর্য্য হইতে সঞ্জাত হইয়া তাহারই প্রভাবে আলোকিত, অনুরঞ্জিত ও গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সূর্য্য সৌরজগতের প্রাণ স্বরূপ আত্মা। যেমন আত্মা না থাকিলে দেহের অস্তিত্ব থাকেনা, পঞ্চভূতময় দেহ পঞ্চভূতে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, ঠিক তদ্রূপ সূর্য্য না থাকিলেও জগৎ নিমিষে ধ্বংস হইয়া অনন্ত নীহারিকায় পরিণত হইয়া পড়ে। কাজেই সূর্য্য জগতের প্রাণ স্বরূপ-

আত্মা। ইহা অবিসম্বাধি সত্য। শ্রুতি বলেন, যাঁহার অচিন্ত্য মহিমায় প্রভাবিত হইয়া সূর্য্য স্ব স্ব সৌরজগতের সর্ব্বত্র আলোক প্রদানে, তথা অনুরঞ্জনে ও গতিদানে সমর্থ হন, তাহারই যথার্থ নাম ভর্গঃ। এই ভর্গঃ প্রভাবেই সূর্য্য মহা মহীয়ান, জগতের প্রকাশক আত্মা। অনন্তধা বিচ্ছুরিত জ্যোতিরই গর্ভ এই ভর্গঃ। অনন্তরূপে রূপায়িত জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার একমাত্র খনি, অনন্ত মহিমায় অভিব্যঞ্জক বিষ্ণুরই অভিন্না শক্তি। ইহাই তাঁহার অবর্ণনীয় অচিন্ত্য মহিমা।

আপন আপন কক্ষে ভ্রাম্যমান গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত অনন্ত সৌর-জগতের প্রকাশক ঐ অনন্ত সূর্য্য মণ্ডলের যিনি অধিদেবতা, সর্ব্ব সবিতার সবিতারূপে যিনি পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে সকলেরই গতিদাতা তিনিই বিষ্ণু, তিনিই নারায়ণ। সেই তিনিই সর্ব্ব আত্মার আত্মা, অন্তর্যামী, আমাদের হৃদয়বিহারী হরি, - সর্ব্ব কেন্দ্রের কেন্দ্র স্বরূপে অভিলক্ষিত সর্ব্ব শক্তিমান ভগবান। ঐ সুমহান্ ভর্গগুণে ইনি নিত্য দীপ্যমান দাতা। জলে, স্থলে, অনলে ও অনিলে, কি অন্তরে, কি বাহিরে, সকলের যময়িতা-সর্ব্বত্র দেবনশীল পরমদেবতা।

এই সর্ব্বগ ঐশীসত্তার নিরন্তর অনুচিন্তনে আত্মা ক্লেশমুক্ত হইয়া যায়। তাই প্রোক্ত দিব্য সংবেদনে অনুবেদিত হইবার নিমিত্ত ঋষিগণ জনসাধারণে খুব চতুরতার সহিত প্রচার করিয়াছেন -"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ"।

মধ্যবর্ত্তী শব্দ অত্রকেন্দ্র পরিলক্ষণার্থ সতর্কতামূলক উক্তি। ধ্যেয়ঃ, উচিতার্থে "য" প্রত্যয়। উক্তরূপে ধ্যান করাই বিধি। উক্তরূপে ধ্যান না করিলে অনন্তে সমাহিত হওয়া যায় না। আমাদের আত্ম-চৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া অনন্তে সমাহিত হইবার ইহাই ঋষি প্রদর্শিত সহজ অথচ সুন্দর কৌশল। শুধু জগন্মঙ্গল ব্রত উদ্‌যাপনার্থ সেই মহানুভব ঋষিদের মহনীয় চিন্তার ইহাই একমাত্র বরণীয় দান, যাহা আমরা পরবর্ত্তীকালে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতএব বিষ্ণু সর্ব্বময়, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বরূপী, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যোন নিগ্রহ ও অনুগ্রহে শক্ত, ভক্ত বিনোদন, জনার্দ্দন, মধুসূদন সর্ব্বশক্তির উৎস, সর্ব্বগ, স্বতন্ত্র, অতুলনীয়, অপ্রাকৃত, অগ্রম্য, অনন্ত, অপার, পরাবর, অচিন্ত্যগুণ, অনির্ব্বচনীয়, পরাৎপর, পরতত্ত্বেরই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রতীক। প্রদর্শিত তত্ত্ব বিচারে ইহা প্রতিপন্ন হয়। ঐ পরাৎপর পরতত্ত্বের বেদান্ত সম্মত যে প্রণাম মন্ত্র রহিয়াছে তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

ওঁ পর পরস্মাৎ প্রকৃতেরনাদিমেকং
নিবিষ্টং বহুধা গুহায়াং
সর্ব্বালয়ং সর্ব্বচরাচরস্থং
নমামি বিষ্ণুং জগদেক নাথম্।।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

অধিকন্তু শালগ্রাম শিলাচক্রে অধিষ্ঠিত নারায়ণ যে অনন্তরূপী পরমাত্মা ইহা তুলসী প্রদান মন্ত্রদ্বারাও পরিলক্ষিত হয়। যথা-

ওঁ শালগ্রাম শিলাচক্রাধিষ্ঠিতায় নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা, এতৎ সচন্দনতুলসী পত্রং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ।

এইভাবে বিচার পরায়ণ প্রত্যেক সজ্জন বলিতে পারেন যে - শালগ্রামে উক্তরূপে ধ্যান করিতে যাওয়া, ইহা নিরক্ষরে আক্ষরিক জ্ঞান দিবার মত।

যেরূপ অতি সুকুমারমতি বালক বালিকাদের পঠন পাঠন সৌকার্য্যার্থে মহামতি শিক্ষকগণ, অ-অজগর, আ-আনারস, ই-ইঁদুর বলিয়া পাঠ দিয়া থাকেন। এবং উক্তরূপে পাঠাভ্যাসী বালক বালিকাদের সহজে বর্ণ পরিচয় হইয়া যায়। যেমন একবার বর্ণ পরিচয় হইয়া গেলে পূর্ব্ব গঠিত ক্রমের আর প্রয়োজন হয় না, তাহারা বুঝিতে পারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যের সুযোগরূপে উক্ত ক্রম সময়োচিতভাবে অবলম্বিত হইয়াছিল। এখানেও তদ্রুপ।

যাঁহারা সমাহিত হইতে চলিয়াছেন, তাঁহারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন যে শালগ্রাম-শিলা নহে। ইহা তত্ত্ব বস্তু, অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ, - আমাদের হৃদয় নিহিত চিৎ। ইহার সহিত

আদ্যন্ত বিহীন অখণ্ড শিলাখণ্ডেরই কথঞ্চিৎ তুলনা করা যাইতে পারে।

ইহার প্রথম প্রতীতি ব্রহ্মরূপে, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মারূপে, তৃতীয় প্রতীতি ভগবান রূপে, সাধকের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি যোগের পরাকাষ্ঠা দশায় ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। উক্ত দিব্য-অনুভূতির সাক্ষ্য শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়-

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১১

উক্তরূপে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, শালগ্রাম শিলার মধ্যগত ছিদ্র অবলম্বনে জগন্নিবাস শ্রীশ্রীভগবানের অর্চ্চনা করা; আর হৃদয় নিহিত চিৎকেন্দ্রে দৃঢ় ত্রাটক সংযোগে সমাহিত হইতে যাওয়া, ধ্যানে তৎ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে চাওয়া, বস্তুতঃ এক। ইহাই সুগুপ্ত ত্রাটক পদ্ধতি; ইহা সচ্ছিদ্র শালগ্রামে নারায়ণ অর্চ্চনার গুহ্য সংকেত। ইহা দ্বারা বুদ্ধিমান জীব (সাধক) অবলীলাক্রমে আপনার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের গতিদাতা সেই পরম আশ্রয় তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন।

এই-গেল ব্যষ্টি জীবগত অবস্থার কথা। তারপর সমষ্টির দিকে, আরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুভূতি পাইবার দিকে আমাদের

দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। ঋষি তাঁহার সত্য সংবেদনে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য শালগ্রাম পূজায় আরও কি প্রকার উন্নততর পন্থায় নির্দ্দেশ দিয়াছেন, এস্থলে তাহারও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি - সর্ব্বপ্রথম ব্যষ্টি জীবের হৃদয়-বিহারিণী চিৎশক্তিকে অবগত হইয়া, ঋষি পশ্চাৎ সমষ্টি ক্ষেত্র ঐ ঈশ্বরী চিন্মূর্ত্তির বিচিত্র স্ফুরণ, একাধারে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবের অপরূপ খেলা নিরীক্ষণ করতঃ ভক্তিভরে প্রণত হইয়াছেন, প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে আত্ম নিবেদন করিতে গিয়া অকুণ্ঠ কণ্ঠে কত স্তব স্তুতি করিয়াছেন।

নমো অনন্তায় সহস্র মূর্ত্তয়ে,
সহস্র পাদাক্ষি শিরোরুবাহবে।
সহস্র নাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে
সহস্র কোটি যুগধারিণে নমঃ।।

-গর্গ সংহিতা ৯/১২/ বিজ্ঞান খণ্ড

হে অনন্ত! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বহুরূপে বহুনামে প্রকাশিত রহিয়াছ। তোমার সহস্র সহস্র পদ, পক্ষ, শির, অক্ষি ও বাহু দেখা যাইতেছে। হে অনন্ত কোটিযুগধারিন সনাতন পুরুষ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

পরমগুরু পরমেশ্বর মহাযোগেশ্বর হরি কর্ত্তৃক উক্ত বিশ্বরূপে সংবোধিত অর্জ্জুন একদা বলিয়াছেন, -

অনেক বাহূদরবক্ত্র নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।

গীতা ১১/১৬

হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! সর্ব্বত্র তোমাকে বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট, অনন্তরূপ-ধারী রূপে দর্শন করিতেছি। কিন্তু তোমার আদি মধ্য ও অবসান দেখিতে পাইতেছি না।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, বিশ্বতোমুখ ভগবানের অঘটন-ঘটন যোগজ পরম ঐশ্বরিক রূপ ঐভাবে অবলোকন করিয়া ভীতি-বিহ্বল-চিত্ত অর্জ্জুন গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিতেছেন -

নমঃ পুরস্তাদ্ অথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্বঃ।
অনন্ত বীর্য্যামিত বিক্রমস্তং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।।

গীতা ১১/৪০

হে সর্ব্বস্বরূপ! আমি তোমাকে সম্মুখে প্রণাম করি, পশ্চাৎভাগে প্রণাম করি এবং চতুষ্পার্শ্বে প্রণাম করিতেছি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিত বিক্রম, তুমি সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র

বিদ্যমান থাকিয়া প্রত্যেককে বরণ করিয়াছ। অতএব তোমার নাম সর্ব্ব। এইভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার সময় হইলে সাধক বুঝিতে পারেন এ অবস্থা কত দুর্ল্লভ। কত সাধ্য সাধনার ফলে সে এ অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতে পারিয়াছে। সে যাহা হউক, ঋষি এই ব্রহ্মজ্ঞান যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র সোপান হইতেছে, স্বকীয় হৃদয়ে অনুচৈতন্যের সাক্ষাৎকার করা। ইহা আমরা ইতঃপুর্ব্বে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছি।

হৃদয় নিহিত চেতনার অনুভব করিতে হইবে, - ইহা ভগবদ্ আদেশ ইহাই ঋষিদের উপদেশ এবং ইহাই তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে অনুশাসন। ঐ যে অনুচৈতন্যের সাক্ষাৎকার করা সর্ব্বেন্দ্রিয়গম্য সত্যের প্রতক্ষ্যবৎ উপলব্ধি করিতে চাওয়া, তাহা পাঞ্চভৌতিক নহে, উহা চিন্ময়।

যাহা চিন্ময়, তাহা সূক্ষ্ম যোগজ প্রত্যক্ষেরই বিষয়। সুতরাং যাঁহারা যোগী নহেন, সূক্ষ্ম যোগজ-নয়ন যাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ভৌতিক দৃষ্টি সাকার ছাড়িয়া নির কারে, স্থুল ছাড়িয়া সূক্ষ্মে, কদাচ সম্প্রসারিত হয় না বা হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা গুরুকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিদ্ দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়া পড়ে, চিন্ময়ের অতর্কিত দর্শনে তাঁহারা সহসা অপ্রতিভ হইয়া যান এবং কিছুতেই ইহার প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিতে সমর্থ হন না। ইহার স্বরূপ নিরূপণ করা হইল না বলিয়াই যে ইহা সর্ব্বথা মিথ্যা, বুদ্ধি-মোহ প্রসূত, এ প্রকার ধারণা তৎকালে তাঁহাদের হয় না,

কেন না সেই নয়নাভিরাম অলৌকিক অবস্থার মনো-মোহকর দর্শন কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া যায় না। দিব্য দর্শনে দিব্য স্পর্শের আকুল আগ্রহ সাধককে উৎসাহিত করিয়া কেবল ঐ প্রদর্শিত পথে পরিচালিত করিতে থাকে। সাধক যতই অগ্রসর হয়, যতই ইষ্ট বস্তুর সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করে, পথের কুহক-মায়ার প্রলোভন কন্টকরূপে পদে পদে বাধা-বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকে।

তথাপি যাঁহাদের উৎসাহ অদম্য, দিব্য দর্শনে, দিব্য স্পর্শের অধীর আকাঙ্ক্ষা যাঁহাদের উদ্দীপিত, তাঁহাদের অনুচৈতন্যে ব্যাপ্ত-চৈতন্যের দিব্য মহিমা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। ফলে তাঁহাদের জ্ঞান হয়, ঐ দৃশ্য প্রপঞ্চ মরুমরীচিকায় সলিল-ভ্রমের ন্যায় নিতান্ত অলীক নহে; ইহা ব্রহ্মের সত্য সম্ভুতি, - ইহা তাঁহার লীলা বৈভব। এই মহতী লীলা চাতুরীতে উপহিত হইয়া আজ ইনি সহস্র সহস্র হস্ত পদ ও মস্তকাদি বিশিষ্ট এক অদ্বিতীয় পুরুষরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছেন মাত্র। এইরূপে অনন্ত রূপের অন্তরালে থাকিয়া আত্মরূপ প্রচ্ছন্ন করতঃ তিনি আনন্দের খেলা খেলিতেছেন। তাই তিনি নিরাকারে সাকার, একে অনন্ত।

ঐ যে বিশ্বরূপ দর্শন-অতীন্দ্রিয় তত্ত্বানুভূতির কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, শালগ্রামে নারায়ণ অর্চ্চনা প্রসঙ্গে তাহা পরিজ্ঞাত হইবার উদার সংকেত; অথবা সংকেত বলিব কেন, তাহারই স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ রহিয়াছে।

ওঁ সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্টা অত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্ ।।

ঐ যে সহস্র-শীর্ষা পুরুষ যিনি বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজমান তাঁহাকে পাইতে হইলে অতীন্দ্রিয় চেতন ভূমিতে উপনীত হইতে হয়। নচেৎ তাঁহার দর্শনলাভ একান্ত অসম্ভব। তাই মন্ত্রে বিশিষ্ট পদ রহিয়াছে -

"অত্যাতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্" ইহাই এই অবস্থায় পৌছিবার উপযুক্ত সংকেত। এইভাবে বিচার করিলে আমরা জানিতে বা বুঝিতে পারি সহস্র-শীর্ষা পুরুষ অর্থাৎ ব্যাপ্ত চেতনাটি কিভাবে, কোন্ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে পাইতে হইলে-

"স্ব শিরসি পুষ্পং দত্ত্বা সোহহমিতি বিচিন্ত্য মানসোপচারে সম্পুজ্য"।

এই ক্রমে মানসোপচারে মানস পূজা করিতে হয়। কাজে কাজেই ঋষি প্রদর্শিত পথ ভিন্ন তাঁহাকে লাভ করিবার আর পথ নাই।

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহয়নায়"।

তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মৃত্যু অতিক্রম করিবার আর উপায় নাই।

মুগ্ধ-শোক প্রভৃতি, এ প্রকার ধারণা ভবকালে তাহাদের হয় না,

এইক্ষণে "দশাঙ্গুলম্" পদে কি বুঝাইতেছে তাহাই আলোচনার বিষয়। আঙ্গুলি শব্দ পরিমাণ বাচী। যাহা পরিমাণ বাচী তাহা প্রমেয়, আবার তাহাই দশেন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল জগৎ; সুতরাং দশাঙ্গুলম্ পদে দশেন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল জগতই উপলক্ষিত হইতেছে। জগৎ সান্ত ও সসীম। অসীম অনন্তকে পাইতে হইলে স্বরূপতঃ তাঁহাকে বোধে বোধ করিতে হইলে দশেন্দ্রিয় গ্রাহ্য এই স্থূল জগৎ অতিক্রম করিতে হয়; নতুবা পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাহার সত্ত্বায় সত্ত্বাবান্ তাঁহাকে লাভ করা যায় না। ইহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্যই ঋষি বিধিমুখে বলিয়াছেন, -

"অত্যাতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্"

এই দশাঙ্গুল অতিক্রম করিতেই হইবে। তিনি যে দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। দশাঙ্গুল অতিক্রম না করিলে, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান-গ্রাহ্য এই জড়রূপের পরপারে উপনীত হইতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কেননা তিনি অধোক্ষজ-নিত্য, সৎ, চৈতন্যরূপে একমাত্র বিশুদ্ধ মনের গোচরে আসিয়া থাকেন।

সর্ব্বে পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে

অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।।

শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/৬

যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত সত্ত্বায়-শ্রীশ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির সঞ্চার হইয়া সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্ত

হইয়া পড়ে এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হইয়া যায়, তাহাই জীবের পরমধর্ম।

এইরূপে তত্ত্ব বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই ঋষিরা বিধি নিষেধ বাক্য প্রণয়ন পূর্ব্বক জীবের অধোগতি নিবারণ করিতে কন্টকের দ্বারা কন্টক উচ্ছেদ করিবার মত, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মময় জগৎ অতিক্রম করিতে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য এই পূজা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতেই ব্যক্তিগত জীবের আত্মগত চৈতন্য অবলম্বনে ব্যাপ্ত চৈতন্য অধীত হইবার কথাকে শালগ্রাম শিলা-চক্রাকারে অভিনব রূপ দিতে গিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান আলোচনার দুরূহ পথে, কী এক নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের সাধন ভজনের চরম অনুভব, স্থূলে সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ও সাকারে চিদাকার জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র সৃষ্ট-রাজপথ।

এই পথে মৃদঘন জগৎরূপে, চিদ্‌ঘন ব্রহ্মরূপ সহজে বা সহসা ভাসিয়া উঠে। ইহা শুধু কথার কথা নহে। সত্য সত্যই সকল মানুষ সকল সময়ে জ্ঞানের চরম সীমায় উপলব্ধ এই ঘন অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন। সচরাচর আমরা জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে ঘন অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, তাহা অজ্ঞদিগের অজ্ঞান দৃষ্টিতে নামরূপে উপহিত জগৎ, আবার তাহাই জ্ঞানীদের জ্ঞানদৃষ্টিতে নামরূপ বিরহিত ব্রহ্ম। যখন ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠে, মৃদঘন জগৎরূপের চিদ্‌রূপের ঘন বিজ্ঞান ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসে, তখনই সূর্য্যোদয়ে নৈশ

অন্ধকারের ন্যায় জগদ্‌ভাব ধীরে ধীরে অভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। তাই আচার্য্য শঙ্কর এই পরম সত্যে উপনীত হইবার জন্য জীবকে নির্ব্বেদ সূত্রে উপদেশ দিয়াছেন, -"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"।

বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া এই ঘন বিজ্ঞান লাভ করা যায় না। কেবল এই বিষয়টি আপাততঃ শ্রুত হইয়া থাকে বস্তুতঃ ইহাকে বোধে বোধ করিতে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাই গুরু-বেদান্ত অধ্যয়ন করা চাই। কেবল গুরু-বেদান্ত অধ্যয়ন দ্বারাই এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞান আয়ত্ত হয় এবং তদবলে জ্ঞান হইতে পারে-জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমুচ্চয়-একমাত্র পূজ্য পূজাক্রম দ্বারাই, এই ঘন-বিজ্ঞান আরও সহজে লাভ হয়।

ধন্য গুরো! ধন্য তোমার অপার মহিমা! ধন্য তোমার অনুসরণকারী প্রিয় সেবক!

ধ্যান-মূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজা-মূলং গুরোঃপদম্।

মন্ত্র-মূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃকৃপা।।

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!!

হরি ওঁ

— সমাপ্তম্ —